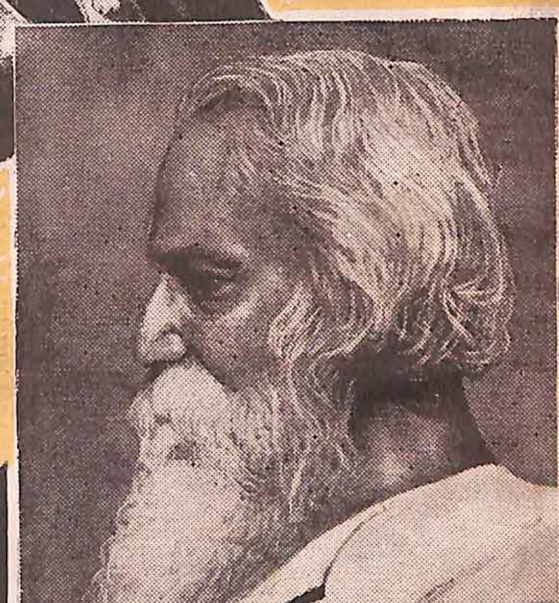
শেষ রবি





শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরী ও শিশুপাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত [কলিকাতা গেজেট ৩।৫।৫১ দ্রষ্টব্য]

ছোট রবি

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

কল্পনা বুক হাউস
৫৬।১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

পরিমার্জিত নূতন সংস্করণ

মাঘ ১৩৯৫

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

কল্পনা বুক হাউস-এর পক্ষে শ্রীদিলীপ কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
এবং শ্রীনিশীথ কুমার ঘোষ কর্তৃক দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

**

আয়রে তবে, মাত্‌রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে !
পিছন পানের বাঁধন হতে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপ্‌নাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

**

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ছোট্ট রবি	৫
২। ফুট্‌ফুটে রবি	৭
৩। খেয়াল-খেলা	৯
৪। আতা ফলবে ছাদে	১১
৫। পুকুর ঘাটে কত কি !	১৪
৬। মাটি খুঁড়লেই পাতালপুরী	১৬
৭। মই লাগিয়ে মেঘে ওঠা	১৮
৮। সবই আজব	২০
৯। পালকি চলে সাগর জলে	২২
১০। বুনো বাঘে নৌকো টানে	২৪
১১। সিংগিমামা কাটুম	২৬
১২। জামা আছে পকেট নেই	২৮
[illegible]৩। যাত্রা শুনে কতই খুশি	৩১
[illegible] মুসকিল যত পড়ার বেলায়	৩২
[illegible] অন্ধকারে উঁকি মারে	৩৬
১৬[illegible]টি পুঁতলেই আম	৩৭
১৭। [illegible]ম্যান আর রাশিয়ান	৩৯
১৮। ছাদের বাগান	৪২
১৯। কাব্য হোল সরু	৪৫
২০। ভালো গানের পুরস্কার	৪৯
২১। বই পড়ার বিষম ঝোঁক	৫১

বিষয়			পৃষ্ঠা
২২। ধান ক্ষেতে চাল ফলে	...	...	৫৩
২৩। হিমালয় কথা কয়	...	...	৫৭
২৪। মায়ের কাছে কতই আদর	..	...	৬১
২৫। বাড়ীর পড়া	...	...	৬৩
২৬। বড় হোলেন ছোট্ট রবি	...		৬৫
২৭। বুড়ো হয়েও বুড়ো নন	...	...	৬৭
২৮। শিশুর সাথী বিশ্বকবি	...	...	৬৯



তোমাদেরই মতো ছোট্ট একটি ছেলে। এই ছেলেটিই যখন বড় হোল, কত তাঁর নাম বেরুলো—এমন নাম যে, জগৎ জুড়ে ধন্যি ধন্যি! তা আবার শোনেনি কে? তোমরাও তা শুনেছ। সে নামটি হোল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই গল্প তাঁকেই নিয়ে।

ছবিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছ তো? দেখে কি মনে হয়? মনে হয় না কি যে, একজন ঋষি বা মুনি? সত্যিই তিনি তা-ই? তাঁর কাছে গিয়ে বসলে কি মনে হোত জানো? মনে হোত—কি তাঁর দেখি? তাঁর চোখ দুটি দেখি, না চেহারাটি দেখি, না

তাঁর কথা শুনি, না কি করি! এক সঙ্গে এই সব তোলপাড় লাগিয়ে দিত মনের ভেতর। এমনি ছিলেন তিনি চমৎকার!

এখন,—ভাবতে পারো কি তোমরা, মুনি-ঋষির মতো চেহারা যাঁর, জগৎজোড়া নাম যাঁর, তিনিই একসময় ছিলেন তোমাদেরই মতন ছেলেমানুষ, আর ছেলেমানুষী করতেন কত রকমের যে, তার কি ঠিক আছে কিছু? খুব বড় যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথা এখন থাক। তা তোমরা বড় হয়ে পরে তখন জেনো, আজ শুধু ছোট-ছেলে যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথাই বলি তোমাদের। শুনে যাও তোমরা তাঁর যত সব ছেলেমানুষীর গল্প, আর মিলিয়ে নাও নিজেদের সঙ্গে। দেখ, কি মজাই না লাগে শুনতে।



ফুটফুটে ছেলেটি, ধবধবে তাঁর রঙ—হাসি-খুসিতে ভরপুর। এই হোল ছোট্ট রবি। সব কিছুই জানবার দিকে ঝোঁক। চাকর আগলে রাখে সবখন। পুকুরঘাটে না যায়—বাইরে বেরিয়ে না যায়। চোখে চোখে রাখে সাবধানে। রবির মন চায় ছুট দিতে, বাইরে গিয়ে ছুটোছুটি করতে পেলে কি মজাই না হোত! কিন্তু যাবেন কি করে? যে কড়াক্কড়ি!

বাইরে যেতে পান না তো! তাই ফাঁক-ফুকর দিয়ে যা দেখেন, তাতেই হয়ে যান বিভোর। ওই তো, পাখিগুলো কেমন উড়ে চলেছে—কেউ তো রোখে না ওদের! ওই ওখানে, কাঠবেড়ালী দুটো হুটোপাটি লাগিয়েছে কেমন, ডালে ডালে! ওই যে আর একটা! কি মজাই না ওদের! ফুলগুলো কেমন ফুটে রয়েছে থরে থরে—ওদের বুঝি 'ফুল ফোটানোর খেলা!' এই রকম, যা পড়ে তাঁর চোখে তারই কথা ফুটে ওঠে যেন তাঁর মনে। শিউলি গাছের ছায়ায় শালিক পাখিগুলো কিচিরমিচির লাগিয়ে দিয়েছে

এক সঙ্গে—ওই বুঝি ওদের গান! গাছগুলো সব হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেমন মনের সুখে, আর শুধুই কেবল আকাশ দেখছে। আকাশের নীচে ওই যে মেঘগুলো—ওদের তো আরো মজা!—

'আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা,
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।'

এই রকম, আপন মনে তিনি প্রকৃতির খেলা দেখেন। গাছ-পালা, ফুল, পাখির ডাক, আকাশ, মেঘ—সব যেন কথা কয়, আর তিনি যেন তার মানে বোঝেন!



দুপুর বেলা ঘুমিয়েছে সবাই। রবি পা টিপে টিপে হাজির হন বাড়ীর ভেতরকার বাগানে। এখানে কিছু নেই তেমন। সব চুপচাপ নিঝুম। এই নিঝুম ভাবটা তাঁর লাগে বেশ। ভয়ও লাগে না যে তা নয়। ভয় ?—কিসের ভয় ? এদিকে নাকি ভূত থাকে। বাড়ীর ঝি-চাকরেরা বলেছে সে কথা। কতদিন তারা দেখেছে। ভূতটা নাকি বাদাম গাছের ডালে এক পা, আর তেতলার কার্নিশে আর এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে রাতের বেলা। মাছের উপর তার ভারি লোভ। কোন কোন দাসী ভূতটার নাকি সুর—'দেঁ নাঁ—দেঁ নাঁ', শুনতে পেয়েছে আর দড়াম্ করে আছাড় খেয়ে পড়েছে কতদিন ! তবে ভূতের ভয় তাঁর কিছুই করতে পারে না। একলা ছাড়া পেয়ে তিনি খুসিই থাকেন আপন মনে।

কোন দিন বা দুপুরবেলা চুপি চুপি বাড়ীর পিছনের গোলাবাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢোকেন। এই জায়গাটাতে তাঁর মজা লাগে বেশী—

'ঐ আমাদের গোলাবাড়ী,
গোরুর গাড়ী
পড়ে আছে চাকাভাঙ্গা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা!
সেথা বেড়ায় যক্ষি বুড়ি
গুড়ি গুড়ি।
আস্‌শেওড়ার ঝোপে ঝোপে।
ফুলের গাছে
দোয়েল নাচে
ছায়া কাঁপে।
লুকিয়ে আমি সেথা পালাই···
ভাঙা গাড়ী
দোলাই নাড়ি
ঝেঁকে ঝেঁকে।'

এক একদিন বাঁখারি একটা নিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকেন মহা কৌতূহলের সঙ্গে। ভাবেন, মাটির ভেতর থেকে না জানি কি রহস্যই বা বেরিয়ে পড়ে!



আতা ফলবে ছাদে

কত কি যে কথা ওঠে তাঁর মনে। একবার তাঁর মনে হোল, বাগানের ওই আতা গাছটার মতো তিনিও একটা আতা গাছ করবেন। জায়গা ঠিক হোল ছাদের ওপর। ছাদের এককোণে ধূলোবালি জমা হয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে দিলেন আতার বিচি পুঁতে। বিচি পুঁতে রোজ রোজ জল দেন আর দেখেন গাছ বেরিয়েছে কিনা।

'আতার বিচি নিজে পুঁতে
পাব তাহার ফল,
দেখব বলে ছিল মনে
বিষম কৌতূহল।'

একদিন বিকেল বেলা। বড়দের একজন এসে পড়েন ছাদে।

—ও রবি, কি করছো তুমি ওখানে ?

—আতা গাছ বেরুলো কিনা দেখছি।

—আতা গাছ ? ওখানে কখনো আতা গাছ হয় ! শুকনো ছাদ যে !

—কি হয়, দেখিই না! রোজ তো জল দিই।

কানে আসে দেউড়ির দিক থেকে ডুগডুগির আওয়াজ। ছুটে চলেন রবি সেই দিকে। গিয়ে দেখেন উঠোনে এসেছে ভালুক-নাচওয়ালা আর সাপুড়ে। ভালুক-নাচ দেখে মেতে ওঠেন রবি। ভালুক-নাচের পর বাঁদর-নাচ। একটা ধাড়ী বাঁদর কোমরে ঘাঘরা এঁটে, ঘুঙুর বেঁধে ধেই ধেই করে নাচ দেখায় আর ডিগবাজী খায় কত রকমের। এই দেখে হাততালি দিতে থাকেন রবি। শেষকালে হয় সাপের খেলা। বড় বড় সাপগুলো ফোঁস্ ফোঁস্ করে ফণা তোলে আর দুলতে থাকে সাপুড়ের বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে। কি মজা দেখতে!

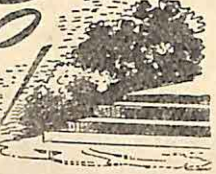
পরের দিন সকালে গেলাস ভরে জল নিয়ে গিয়ে দেখেন, এ কি! সে ধূলোর কাঁড়িও নেই—আতা বিচিও নেই। সবই ফেলে দিয়েছে ঝেঁটিয়ে চাকর হতভাগা। আপন মনে বলতে থাকেন—'কত করে জল দিতুম রোজ! আতা হলে তোমরাও তো খেতে? তা না—দিয়েছে সব ফেলে।'

আতা গাছ হতে পেল না। রবি ভাবেন—'এবার একটা বাগান করবো ঘরের ভেতর। ফুল ফুটবে ঘরের মধ্যেই। কি মজাই হবে!' বাইরের বাগান থেকে লুকিয়ে পাথর কুড়িয়ে এনে দোতলার ঘরের এককোণে জড়ো করলেন আর তৈরী করলেন একটা পাহাড়। তারই ফাঁকে ফাঁকে পোঁতা হোল ফুলগাছ।

তাতে জল ঢালবার কি ঘটা! গাছের সেবা এমন করে হতে লাগলো যে দুদিন না যেতেই গাছ গেল মরে।

'তাইতো! মরে গেল যে গাছগুলো! যাক গে। পাহাড়টা তো রইলো! তা-ই বেশ।' এতেই তিনি খুসি। খুসি এই ভেবে যে, বড়রা যখন দেখবেন, তাক লেগে যাবে তাঁদের, এমন একটা জিনিস দেখে। তারপর বড়দের ডেকে আনলেন যখন, ফল দাঁড়ালো উলটো। "এ কি করেছ রবি? ঘরের মধ্যে এসব কি?" বলে চাকরদের উপর হুকুম হোল, তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেবার। রবির সে কি দুঃখ! 'অ্যাঃ, বড়রা কিছুই কি বোঝে না!' মনটি তাঁর খারাপ হয়ে যায় খুব বেশী।

পুকুর-ঘাটে কত কি!



চাকরগুলোকে তাঁর ভাল লাগে না মোটেই। তারা কেবলই তাঁকে আগলে রাখে। একটু কোথাও কি পা বাড়াবার যো' আছে! শ্যাম চাকরটা একেবারে যেন কি! সে রবিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে একটা গোল দাগ কেটে দেয় তাঁকে ঘিরে। দাগ কেটে দিয়ে বলে—"এই যে দাগ দিলুম, এর বাইরে পা বাড়িও না যেন; বাইরে পা বাড়িয়েছ কি গেছ। যতক্ষণ না ফিরে আসি, বসে থাকো এর ভেতরে।' এই বলে সে চলে যায়। প্রায়ই সে এই রকম করে।

সে চলে গেলে জানালার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন রবি চুপটি করে। দাগের বাইরে যাবার সাহস হয় না। রামায়ণের গল্প শুনেছেন তো। জানেন তো তিনি, কত বিপদ দাগের বাইরে। সীতা যেই দাগ ছাড়িয়ে বাইরে গেলেন, রাবণ অমনি খপ করে ধরে নিয়ে গেল। কাজ নেই বাপু বাইরে গিয়ে!

জানালার নীচেই একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরের জলে রোদ পড়ে করছে চিক চিক—যেন সোনা মাখিয়ে দিয়েছে। এই দিকে তিনি চেয়ে থাকেন।

দেখেন সেটাকে, ঠিক একখানা ছবির মতো। পুকুর ঘাটে

কত লোক নামছে—কত রকম ভঙ্গী করে নাইছে সবাই; পাতিহাঁসগুলো কেমন সার বেঁধে সাঁতার কাটছে। কোন কোনটা ডুব দিয়ে গুগলি তুলছে।

পুকুরের ওদিকটাতে খুব বড় একটা বটগাছ। তার তলায় কয়েকটা শালিখ পাখী কিচিরমিচির করে নাচ লাগিয়ে দিয়েছে। বটগাছটার চারদিকে ঝুরি নেমেছে যে কত! গাছের তলাটায় দিনের বেলাতেও কি আঁধার! সেই আঁধারের ভেতর কি সব থাকতে পারে? এবার সেই সব কথাই মনে ওঠে তাঁর। দুপুরের পর ঘাট হয়ে যায় খালি, তখনো তিনি বসে থাকেন সেখানে, আর ভাবেন—

"নীচের তলায়
তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ।
সেইখানেতে
কারা সবাই
রয়েছে চুপচাপ।
কোণে কোণে
আপন মনে
করছে তারা কি কে।
আমারই ভয়
করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।"

মাটি খুঁড়লেই পাতালপুরী

রবির সব দিকেই চোখ। একদিন দেখেন যে উঠানে গর্ত খুঁড়ছে লোকেরা। থাম পোঁতা হবে। রবি দেখতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কতদিন তিনি মনে মনে ভেবেছেন—'পৃথিবীর উপর তলাটাতেই তো থাকি আমরা। এর ভেতর তলাটাতে কি আছে? পাতালপুরী? সেখানে থাকে কারা? কোন উপায়ে কি জানা যায় না? ধরো, যদি বড় একটা বাঁশ ঠুকে ঠুকে পোঁতা যায়, তার উপরে আর একটা, তাতে না হলে আর একটা—এই রকম করে অনেকগুলো বাঁশ পর পর যদি পোঁতা যায়, তাহলে নাগাল পাওয়া যেতে পারে হয়তো পৃথিবীর তলাটার।'

'ওই তো গর্তটা বড় হোল। একটা মানুষ তো বেশ ঢুকে গেল। আরো বড় করুক না গর্তটা। বড় করতে করতে চলে যাক না নীচে। তাহলে পাতালপুরীতে পৌঁছুতে পারে হয় তো।'

'ওহে, তুমি বেরিয়ে এলে কেন ? আরো বেশী করে খোড় না ! খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে পাতালপুরীতে চলে যাও না।'

লোকটা হাসে। তারপর, খুঁটি বসিয়ে গর্ত বুজিয়ে দেয়। রবির হয় আপসোস। 'বড়রা যেন কি ! কিছুই করতে চায় না।' তাঁর মনের মতো কোন কাজই যে হয় না ! ভারি নিরাশ হন তিনি।



মই লাগিয়ে মেঘে ওঠা

ওই যে মাথার উপর নীল আকাশটা—চাঁদোয়ার মতো যেটা আগাগোড়া জুড়ে রয়েছে—যেখানে তারাগুলো রাতের বেলা বসে বসে মাটির দিকে মিটি মিটি চেয়ে থাকে, আর যেখানে বর্ষার দিনে ঐরাবতের শুঁড় দেখা যায়—ওখানে নাকি পৌঁছানো যায় না। মাষ্টার মশায় বলেছেন, ওটা মাথায় ঠেকে না আদবেই—সিঁড়ির উপর সিঁড়ি, তার উপর সিঁড়ি লাগিয়ে যতই কেন উঠে যাও না উঁচুতে, ওই নীল চাঁদোয়া মাথায় ঠেকবে না কিছুতেই। ভারি মজার কথা তো? আরো মজা যে, এই কথাটা, আবার যাঁরা মাষ্টার মশায় তাঁরাই শুধু জানেন, আর কেউ জানে না।

দুপুর বেলা এক এক দিন পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে একেবারে তেতলার ছাদে পালিয়ে যান। দূরের কত কি দেখা যায় সেখান থেকে। তেতলায় তাঁর বাবার ঘর। তাঁর বাবা অনেক সময় থাকেন কলকাতার বাইরে। ঘর পড়ে থাকে খালি। একটা জলের কল আছে সে ঘরের মধ্যে। তিনি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলেন। তারপর জলের

কলটি খুলে তার নীচে মাথা পেতে দিয়ে নাইতে থাকেন মনের সুখে, আর জল নিয়ে খেলা করতে থাকেন যত খুসি। তারপর সেই ঘরের একটা সোফার উপর মজা করে বসে থাকেন। বসে বসে আকাশের নীল চাঁদোয়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন। দূর থেকে চিলের ডাক, ঝাঁঝাঁ-করা রোদ, চারদিকের নিঝুম আর চুপচাপ ভাব—এই সব মিলে তাঁর মনটাকে উদাস করে তোলে, আর কত কি ভাবনা আসে তাঁর মনে—

"বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরেব থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানা রকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলা-ফেরা
সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরতো থাকি থাকি,
বানের জল শেওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।"

সবই আজব

কেমন ? শুনছো তো ছোট্ট রবির কথা ? মিলছে কি কিছু তোমাদের সঙ্গে ? আরো শোন—

বাড়ীর বাইরে তাঁর পা বাড়ানো বারণ তো ? তাই, নতুন যা দেখেন, তাই মনে হয় আজব।

এক ইহুদি আসে আতর বেচতে। একে তার ইহুদির পোশাক, তায় আবার লাগিয়ে নিয়েছে তাতে কতকগুলো ছোট ছোট ঘুনটি। টুন্ টুন্ টুন্ করে বেশ এক আওয়াজ হতে থাকে চলবার সময়। এই দেখেই তাঁর মন নড়ে ওঠে। এ তো বেশ মজা ! দূর থেকে ডাকেন 'ঘুন্টিওয়ালা—ও ঘুন্টিওয়ালা !'

তাঁর বাবা পাহাড় থেকে ফিরবার সময় এক ছোকরা পাঞ্জাবী চাকর একবার সঙ্গে আনলেন। এই বিদেশী ছেলেটাকে পেয়ে কি ভাব তার সঙ্গে। গর্ব করে বলেন—'এ হোল পাঞ্জাবের লোক —যে দেশের লোক তরোয়াল নিয়ে লড়াই করে—ভীম-অর্জুনের দেশের লোক। যা তা কথা কি !' কি খাতির আর কি সমাদর ছেলেটার। বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া, মজার মজার খেলনা

দেখানো, আর কত গল্প—কত কথা তার সঙ্গে। ছেলেটাকে নিয়ে কি যে করবেন, ঠিক পান না।

এক কাবুলীওয়ালা। সে আসে আখরোট, পেস্তা, বাদাম এই সব নিয়ে। ঢিলাঢালা, ময়লা পায়জামা, জবর রকমের ঝোলাঝুলি, দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, এই সব দেখে তাঁর মনে হয়, না জানি কি রহস্য আছে তার ভেতর। ভয়ে ভয়ে দেখেন আর পেছিয়ে যান। নিজের মনে বলেন—'ও, কাবুলীওয়ালা—কাবুলীওয়ালা!'

পালকি চলে সাগর জলে



রবিকে একদিন দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও। খোঁজ-খোঁজ, কোথায় গেল রবি। শেষে দেখা গেল, তিনি একটা পালকির ভেতর একলাটি বসে রয়েছেন—আপনার মনে হাসছেন, হাত নাড়ছেন।

এই পালকিটা অনেক কালের পুরানো। কোন কাজে লাগে না বলে এক কোণে পড়ে রয়েছে। এই অকেজো পালকিটার উপর রবির ভারি টান। ফাঁক পেলেই একলাটি গিয়ে বসেন এই পালকির ভেতর আর ভাবতে থাকেন কত কি—তিনি যেন জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছেন, আর ঐ পালকিটা হোল যেন সমুদ্রের মাঝখানে বড় একটা ডাঙা। কখনো বা তাঁর চোখে পালকিটার চেহারা যায় বদলে। বদলে গিয়ে সেটা হয়ে ওঠে ময়ূরপংখী। ভেসে চলে সমুদ্রে। ডাঙা যায় না দেখা। ময়ূরপংখীর দাঁড় পড়তে থাকে ছপ ছপ, ছপ ছপ। ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাঝিরা বলে, সামাল সামাল—ঝড় উঠলো। হালের কাছে বসে আছে, ও কে?

আবদুল মাঝি !—ভয় নেই তাহলে। রবি দেখতে পান এই সব, পালকির ভেতর বসে বসে।

আবদুল মাঝি যখন আসে, ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম নিয়ে তাঁদের বাড়ীতে, রবি তাকে পাকড়াও করেন—

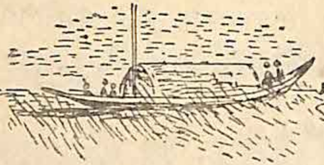
—আবদুল, গল্প বলো তোমার।

—কিসের গল্প ?

—বাঘের আর কুমীরের।

—সে তো বলেছি কতবার।

—আবার বলো।



হুলো বাঘে নৌকো টানে

আবদুল তার গল্প শোনায় রবিকে। একবার তার নৌকো পড়লো তুফানের মধ্যে। ডোবে আর কি নৌকো! মাঝি ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে, আর সাঁতার কেটে চরে উঠে টেনে তুললো তার নৌকো। তারপর দেখে চরের উপর ইয়া বড় এক বাঘ। গায়ে কালো কালো ডোরা—কাঁচা হলুদের রঙ। বাঘটা মাঝিকে দেখতে পেয়ে হালুম করে লাফিয়ে পড়ে আর কি তার ঘাড়ে! মাঝির তবু ভয় ডর নেই। সে এর ভেতরেই দড়ির এক ফাঁস তৈরী করে নিয়েছে। ফাঁস বাগিয়ে ধরে বললে—আও বাচ্চা। বাঘটা যেমনি পা তুলেছে লাফ দেবে বলে, অমনি তার গলায় লাগিয়ে দিলে সেই ফাঁসটা। ফাঁস লাগিয়েই খুব কসে টান। আর যাবে কোথায় বাঘের বাচ্চা। তার জিভ বেরিয়ে পড়লো আর খালি ছটফট করতে লাগলো। তারপর? তারপরেই তো মজা! ফাঁসের দড়িটা জুড়ে দিলে মাঝি তার নৌকোর সঙ্গে, নিজে উঠে বসলো নৌকোর উপর, আর বাঘের পেটে দিল দাঁড়ের খোঁচা। বাঘটা গোঁ গোঁ করে তীরবেগে ছুটে চললো নৌকো টেনে নিয়ে,

আর পৌঁছে দিল পনেরো ঘণ্টার পথ—দেড় ঘণ্টায়। রবি বললেন, 'তারপর ?' তারপর আবার কি ?—শেষ।

বাঘের গল্প হোল, এবার এলো কুমীর। আবদুল মাঝি বলে—কুমীরটার নাকের ডগাই খালি দেখা যায়, গোটা কুমীরটা থাকে জলের তলায়। এক এক দিন নদীর ডাঙায় কাত হয়ে শুয়ে সে রোদ পোহায়। কে বলবে যে সেটা খেজুর গাছ নয়।

এক দিন হোল খুব মজা। ডাঙায় বসে এক বেদেনী দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা বাঁধা রয়েছে পাশে। কুমীরটা কখন জল থেকে উঠে ছাগলছানার ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে চললো জলে। বেদেনীর চোখ পড়লো এবার। সে লাফ দিয়ে বসল একেবারে কুমীরটার পিঠের উপর আর দা দিয়ে লাগাতে লাগলো পোঁচের উপর পোঁচ কুমীরটার গলায়। বাস্,—ছাগলছানা ছেড়ে দিয়ে কুমীরটা ডুব মারলে জলে। 'তারপর ?' তারপর আর কি ? —তলিয়ে গেল জলের তলায়।

সিংগিমামা কাটুম

রবি বলছেন এবার আবদুলকে—'তুমি ধরেছ বাঘ। গুণ টানিয়ে নিয়েছ বাঘকে দিয়ে। আমার আছে সিংগি। সিংগিটাকে আমি বলি দোব, দেখবে চলো। হাঁ করে রয়েছ কি? সিংগি বলি দেখবে চলো।'

এই বলে নিয়ে যান আবদুলকে সঙ্গে করে। আর তাঁর কাঠের সিংগিটাকে হিড়হিড় করে নিয়ে আসেন টেনে। তারপর একটা খাঁড়া নেন হাতে। খাঁড়াটা হোল কাঠের। 'আবদুল, দেখ এবার আমার সিংগি বলি। থামো, মন্তর বলি আগে। হাত জোড় কর।' এই বলে সিংগিটাকে ধরে খাঁড়াটা তুলে মন্তর আওড়ান—

সিংগিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট, ঢুলুকুট, ঢ্যাম্‌কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খটখট খটাস্‌
পটপট পটাস্‌।

মন্তর আওড়াতে আওড়াতে খটাস্ করে মারেন কোপ সিংগির পিঠে। কোপের উপর কোপ। খাঁড়া যায় পটাস্ করে ভেঙে। আবদুল বলে ওঠে 'সাবাস্!'

উঠানের দিক থেকে আওয়াজ এলো 'রে-রে-রে-রে'। কি? ...না ডাকাতের খেলা দেখানো হবে। ছুটলেন রবি সেদিকে। দেখেন কালো কালো জোয়ান সব। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আর কি ভীষণ চেহারা! বড় একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে সাঁ করে উঠে পড়লো কয়েকজন একেবারে দোতলার উপর। দুজন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে এমন জোরে ঠকাঠক্ লাগিয়ে দিলে যে, দেখে গা শিউরে ওঠে। একটা লোক করলে কি, তার ঝাঁকড়া চুলে একজনকে ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরাতে লেগে গেল পাঁই পাঁই করে। একটা ঢেঁকির মাঝখানে চাদর বেঁধে সেটা একজন দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে। কামড়ে ধরে ওই অতবড় ঢেঁকিটা টপকিয়ে ধরে দিলে পিঠের দিকে। এমনিতরো সব গা কাঁপানো খেলা। দুটো রনপার উপর পা রেখে কেমন করে ডাকাতি করবার জন্য ছুট মারে, একপা'র জায়গায় দশ পা ফেলে, আর পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে ডাকাতি করে আবার সেই রাতেই ফিরে আসে—সে খেলাও দেখালে।

জামা আছে পকেট নেই!

রবির বাবার রাজার মতো ধন-দৌলত। অভাব নেই তো কিছুর। তা না থাকলেও রবিকে থাকতে হয় সাধাসিধে ভাবে। কাপড়-জামা পরেন সাধারণ রকমের। জুতোর মধ্যে শুধু একজোড়া চটি। এই চটি পরে চলেন যখন, চটি দুটো পা থেকে খুলে খুলে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে।

রবি একদিন জামা পরতে গিয়ে দেখেন, জামার পকেট নেই। অমনি গস্‌গস্‌ করে চললেন বাড়ীর দরজি নেয়ামত খলিফার কাছে।

—'একি জামা করেছ খলিফা? পকেট কোথায়?'

—'পকেট?—পকেট নেই?' তারপর মুচকি হাসে। বলে '—ও! ভুলে গেছি তা হলে।'

'এমন ভুল আর কোরো না কখনো। আমার এই সব জিনিস এখন রাখি কোথায়?'

এই বলে কয়েকটা ভাঙা কাচের গুলি, পাথর-কুচি—এই সব অমূল্য জিনিস দেখালেন।

জামা-কাপড় যেমন সাদাসিধে, খাওয়া-দাওয়াও তেমনি। কোন রকমের সৌখিনতা নেই। ছেলেদের দেখাশোনা করে চাকর। চাকরের উপর খাওয়ানোর ভার। যে ভাবে খাওয়ান উচিত তা সে করে না। পাত সাজিয়ে খাবার দেয় না কোনদিন! খেতে বসিয়ে দু-তিনখানা লুচি পাতে দিয়েই বলে—'আর দোব? আর চাই?' তার বলবার ধরন দেখে, পেট না ভরলেও, রবি বলেন, 'আর চাইনে।' দুধ খাওয়ানোর বেলাতেও তাই। রবি বুঝতে পারেন সব। তবে বলেন না কিছু। কোন রকম নালিশ নেই তাঁর।

সন্ধ্যেবেলায় চাকরদের ঘরে মাদুর পেতে আসর বসে, রেড়ির তেলের আলোয়। ছেলেদের আট্‌কে রাখবার জন্য সর্দার চাকর রামায়ণ পড়ে শোনায়—সুর করে, ভঙ্গী করে হরেক রকমের। কোনদিন হয় লব-কুশের কথা। এক এক দিন আবার মাঝখানে এসে পড়ে একজন পাঁচালী গাইয়ে। সে এসেই চড়াগলায় সুর ধরে—

ওরে রে লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ

তার এই পাঁচালীর তোড়ের মুখে রামায়ণের সরল পয়ার একদম ডুবে যায় কোথায়।

কিছু রাত হলেই চাকরদের মাদুর-পাতা আসর ভেঙে যায়

রবি তখন মায়ের ঘরে চলে যান শুতে। সেখানে গিয়ে এক দিদিমার মুখে—

“এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ি,
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাত-শ হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোর জাল বোনে সে,
হয় না বুনোন সারা
পণ ছিল তার, ধরবে জালে
লখ্‌খ কোটি তারা।”

এই রকম সব ছড়া আর রূপকথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন রবি।

যাত্রা শুনে কতই খুসি



রবির বাড়ীতে উৎসব আমোদ লেগেই থাকে। গানের মজলিস বসে যখন তখন। যাত্রা হয় মাঝে মাঝে। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করে যাত্রার আসর। বেহালা বাজে, নানা বাজনা বাজে, ঝমাঝম্ করতাল বাজে—যাত্রা হয় সুরু। রবির সে কি আগ্রহ যাত্রা শোনবার! আগ্রহ হোলে কি হবে, সে দিকে যাওয়া একদম বারণ। ছেলেমানুষ যে! রবির দুঃখ হয়—বড়রা যেন কেমন-তরো! সব তাতেই মানা।

একবার ভরসা দেওয়া হোল ছেলেরাও পাবে যাত্রা শুনতে। রবি তখন কি যে খুসি। দেউড়ির সামনে বড় বড় জুড়ি গাড়ী এসে দাঁড়ায়। অতিথিদের খাতির করে এগিয়ে আনা হয়। বসানো হয় যাত্রার আসরে। গোলাপ পাস থেকে গোলাপ জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় গায়ে। হাতে দেওয়া হয় ছোট একটি করে ফুলের তোড়া। এমনিতরো জমকালো আসরে গিয়ে রবি বসলেন যাত্রা শুনতে দাদাদের কাছে। চমৎকার একটি রুমালে কিছু টাকা বেঁধে রবির হাতে দেওয়া হোল। বুঝিয়ে দেওয়া হোল কি করতে হবে। 'বাহবা' পড়লো যেই, রবি অমনি ছুঁড়ে দিলেন ঐ টাকা-বাঁধা রুমালটা যাত্রাওয়ালার দিকে। ছুঁড়ে দিয়ে কি ফুর্তি!

মুস্কিল যত পড়ার বেলায়



রবি একদিন ইস্‌কুলে যাবার বায়না ধরলেন।

"ও সোমেনদা, ও সত্য,—তোমরা চলেছ কোথায়,—ইস্‌কুলে, গাড়ী চড়ে। আমিও যাব তবে।" রবি একদিন বলে বসলেন এই কথা। তাঁর এক দাদা আর ভাগ্নে সত্য চলেছে ইস্‌কুলে, তিনিই বা যাবেন না কেন? মনে করলেন, ইস্‌কুলে যাওয়াতে না জানি কি মজা! কিন্তু অত ছোট ছেলে ইস্‌কুলে গিয়ে করবে কি? তাঁরাও নিয়ে যাবেন না—তিনিও যাবেন। শেষটায় কাঁদতে শুরু করলেন। রবিকে কাঁদতে দেখে তাঁর মাষ্টার ধমক দিয়ে বললেন, 'এখন যেমন কাঁদছো ইস্‌কুলে যাবার জন্যে, এরপর আরো বেশী কাঁদতে হবে না-যাবার জন্যে।' এঁর এই কথাটি সত্যি হয়েছিল পরে। রবি বায়না ধরলেন—কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে জিতলেন—শেষে ভরতি হলেন ইস্‌কুলে।

এর অনেক আগেই বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে তাঁর পড়া হয়েছিল শুরু। পড়ার বই যা ছিল, তাতে ছিল ষণ্ডামার্ক মুনির পাটশালার গল্প। একটা ছবি যা ছিল তা অতি ভয়ংকর!

নৃসিংহ অবতার—বড় বড় চোখ, দাঁত আর জিভ বার করে পেট চিরছে হিরণ্যকশিপুর।

ইসকুলের বইয়ে নৃসিংহ অবতারের দেখা না পেলেও, সেখানে গিয়ে দেখলেন, বেত হাতে মাষ্টার মশাই মাষ্টারি করছেন। ছাত্ররা সব ভয়ে কাঁটা! মার-ধোর কথায় কথায়। বাড়ীর ভাব মোটেই নেই। দেখেশুনে মন তাঁর ভারি খারাপ হয়ে গেল। মন চায়না ইস্কুলে থাকতে।

দিনকয়েক পরে মাষ্টার মশায়দের দেখাদেখি তিনিও শুরু করলেন মাষ্টারি ছুটির দিনে—বাড়ীতে। কতকগুলো রেলিং হোল তাঁর ছাত্র। একটা টুলের উপর বসে বেত হাতে-নিয়ে রেলিং-ছাত্রদের পড়াতে শুরু করলেন। রেলিং-ছাত্রের কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ, তাও তিনি চিনে নিলেন! যেটা খারাপ, তাকে বেত লাগান সপাসপ, আর বকুনি দেন বিষম রকমের—'পড়াতে মন নেই তোর একটুও, বড় হলে করবি কি? কুলিগিরি করতে হবে যে!' তাঁর এই মাষ্টারি, আড়াল থেকে যে দেখে, সেই হেসে ওঠে।

ভাবছো বুঝি তোমরা যে ইস্কুলে ভরতি হয়েই তিনি লিখতে পড়তে শুরু করে দিলেন খুব। মোটেই না। বায়না ধরেন—

"মা গো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া পড়া খেলা।"

শুধু কেবল খেলার দিকেই মন। পড়তে বললে আবার অভিমান করে বলেন—

"তুই কি ভাবিস, দিন রাত্রি
খেলতে আমার মন।
কক্খনো তা সত্যি না মা—
আমার কথা শোন্।
খেলা-ভোলার দিন মা আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে।"

এর পর বলেন একদম শেষ কথা—

"যত ঘণ্টা যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলাম ; কেউ যদি কয় মন্দ
আমি বলব, 'দশটা বাজাই বন্ধ।'
তাধিন তাধিন তাধিন।"

চলতে থাকে নাচের পালা, ইস্কুলে আর যায় কে ! যদিও বা যান, পালিয়ে আসেন।

ইস্কুলে যাওয়া মোটেই ভাল লাগে না রবির। গেলেও পালিয়ে আসেন যখন-তখন। কি করে পালিয়ে আসেন জানো ?

চিঠি লিখিয়ে নিয়ে যান মুনসীকে দিয়ে। মুনসী? সে আবার কে? মুনসী এক মজার লোক। রবির দাদারা এঁর কাছে ফারসী পড়েন। ফারসীর মাষ্টার, তাই সবাই এঁকে মুনসী বলেন। লোকটির চেহারা মিশকালো আর রোগা—শুধু হাড় ক'খানির উপর কালো চামড়া ঢাকা। বেশ মজার লোক মুনসী! ইনি ফারসী জানেন, ইংরেজী জানেন। আর এঁর ধারণা, ইনি লাঠি খেলাও খুব ভাল জানেন। লাঠি হাতে উঠানে দাঁড়াতেন রোদে। নিজের ছায়া পড়তো। নিজের ছায়াটাই যেন একজন লাঠিখেলিয়ে, আর এই ভাব নিয়ে নানান ভঙ্গিতে ছায়ার সঙ্গেই লাঠি খেলতেন। শেষে নিজের ছায়াটার উপর ধাঁ ধাঁ করে বাড়ি মেরে ধরে নিতেন যে তাঁর জয় হয়েছে। তাঁর তখন সে কি হাসি!

মুনসী গান গাইতে বসেন তানপুরা নিয়ে। হাত নাড়েন—দাড়ি নাড়েন—কত কি ভঙ্গি করেন। গান তো নয়, যেন ভূতের চীৎকার! যেমন বেসুরো, তেমনি বিশ্রী। মুনসীর ধারণা তিনি খুব একজন বড় গাইয়ে।

এই রকম যে মুনসী, তাঁকে খুসি করা এমন কি কঠিন। মুনসীকে ধরলেই তিনি রবির ইস্কুলে চিঠি লিখে দেন। হয় অসুখ করেছে, নয় তো কোন কাজ পড়েছে—বা এমনি একটা কিছু। এই রকম চিঠি দেখিয়ে রবি পালিয়ে আসেন ইস্কুল থেকে, যে দিন খুসি।

অন্ধকারে উঁকি মারে

ইস্‌কুল থেকে পালিয়ে এলেও বাড়ীতে রোজ মাষ্টার মশায়ের কাছে পড়তে বসতে হয় রাতের বেলা। পড়তে তো বসেন, কিন্তু রাত আটটা না বাজতেই হাই উঠতে থাকে। তারপর আসে ঘুম। এবার শুনতে হয় মাষ্টার মশায়ের বকুনি। তাতে ফল হয় না কোন। পড়া আর এগোয় না। তখন ছুটি পান ঢুলুঢুলু চোখে। ছুটি পেলেই ছুট মারেন বাড়ীর ভেতরে। ভেতরে যাবার গলিটার কাছে এলেই ঘুম ছুটে যায় একেবারে। ঘুম ছুটে যায় ভয়ে। শুনেছেন, পাশের এঁদো ঘরটাতে যারা থাকে ঘুপ্‌টি মেরে তারা এ-সময় উঁকি-ঝুঁকি মারে। তাদের চেহারা নাকি ভারি বিদখুটে। কী বিকট তাদের 'হাঁ'। জিভ করছে লক্‌লক্‌, কান করছে লট্‌পট্‌! ড্যাব-ডেবে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে বুকের উপর। পা দুটো তাদের উলটো দিকে। ঝি-চাকর কে না দেখেছে তাদের? কে না জানে একথা? যেই মনে আসে এসব, অমনি তড়বড় করে পা চালিয়ে দেন বাড়ীর ভেতরে।

আঁটি পুঁতলেই আম



এক ছুটির দিন তেতলার ছাদে রোদে বসে রবি কি যেন করছেন। এই দেখে ভাগনে সত্য বললেন, "কি করছো রবি, এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে ?" রবি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "থামো, গোল করো না। প্রফেসর যে বিদ্যের কথা বলেছে, সে বিদ্যের পরখ করবো আজ।"

এখন হয়েছে কি, ইস্‌কুলের একটি ছেলে, সে নিজেকে বলে প্রফেসর। সে বলেছে রবিকে,—মনসার আঠা যে-কোন ফলের আঁটিতে একুশ বার মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতলেই এক ঘণ্টার মধ্যে গাছ বেরুবে, ফল ধরবে, আর সে ফল খাওয়াও চলবে। এটা হাতে কলমে পরখ করবার জন্য রবি অধীর হয়ে উঠেছেন। বাগানের মালীকে ধরে মনসার আঠা যোগাড় করেছেন। ছাদে বসে একটা আমের আঁটিতে সেই আঠা মাখান আর রোদে শুকোন। কি খুসি তাঁর মন। ব্যস, এবার একুশবার হয়ে গেছে। এখন পুঁতে দিলেই গাছ বেরুবে আর আম ফলবে। তারপর বাগানে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলেন সেই আঁটি।

সাথীদের ডেকে আনলেন ম্যাজিক দেখতে আর আম খেতে। কই? কিছুই হয় না যে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল, গাছ আর বেরুলো না।

তিনজন তাঁরা ইস্কুলে যেতেন। ভাগনে সত্য, দাদা সোমেন আর তিনি। রবির চেয়ে অনেক বড় এঁরা দুজন। সত্য লেখা-পড়ায় ভাল। রবির ইস্কুলের পড়া যেমন-তেমন। সত্য একবার ভাল করে পাস করে একটা প্রাইজ পেলেন। এই দেখে রবি মহা খুসি। বাড়ীতে ফিরেই ছুটে চললেন এই সুখবরটা দিতে তাঁর গুণদার কাছে। দূর থেকে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, "গুণদা, সত্য একটা প্রাইজ পেয়েছে।"

গুণদা তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—"তুমি প্রাইজ পাও নি?"

রবি বললেন, "না, আমি পাইনি। সত্য পেয়েছে।" নিজে প্রাইজ না পেয়েও তাঁর এত উৎসাহ দেখে গুণদা তাঁকে খুব আদর করলেন আর তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন সকলের কাছে। প্রশংসা আবার কিসের, রবি তা বুঝতে পারলেন না।



পুলিসম্যান এবং রামায়ণ

রবি খেলা করছেন একদিন বাইরে গিয়ে। এমন সময় ভাগনে সত্য তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য হাঁক দিলেন—"পুলিসম্যান! পুলিসম্যান!" রবির বেজায় ভয় পুলিসম্যানকে। তাঁর ধারণা পুলিসম্যান একবার যাকে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না। ঠিক যেন কুমীর। কুমীর যেমন শিকার ধরলে টেনে নিয়ে যায় জলের তলায়, পুলিসম্যানও তেমনি যাকে ধরে, তাকে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে একদম লুকিয়ে ফেলে। পুলিসম্যানের নাম শুনে তিনি খেলাটেলা ফেলে ভোঁ দৌড় দিলেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে তাঁর মায়ের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে মাকে বললেন,—"মা, পুলিসম্যান আসছে···আমাকে ধরবে।" মা একটু হাসলেন, কিছুই বললেন না। রবির কিন্তু সাহস হোল না আর বাইরে যেতে। বাড়ীর ভেতরেই এদিক ওদিক করতে লাগলেন। দেখলেন যে তাঁর এক দিদিমার কোণ-ছেঁড়া রামায়ণখানা রয়েছে সেখানে। তিনি সেটা নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়তে শুরু করে দিলেন এক মনে। সে জায়গাটা এমন করুণ যে পড়তে পড়তে

তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। এখন আর কোথায় তাঁর ভয় !

তোমাদের মনে হতে পারে, রবি তাহলে দুর্বল ছিলেন তো ! তিনি দুর্বল ছিলেন না আদবেই। অসুখবিসুখ তাঁর হোত না কখনো। শরীর তাঁর এত ভালো ছিল যে, জোর করে অনিয়ম করলেও তাঁর অসুখ করত না। জুতা সপসপে করে জলে ভিজিয়ে নিয়ে বেড়ালেন সারাদিন, সর্দি হোল না। শীতের দিনে খোলা ছাদে শুয়ে রইলেন, জামা আর চুল ভিজে গেল হিমে, তবু সর্দি কি কাশি হোল না একটুও। ইস্‌কুল কামাই করবার ঝোঁক হতো যখন, এই সব অনিয়ম করে রোগ আনতে চাইতেন। হোত না তবু কিছুই। একটু বড় হোলেন যখন, খুব ভোরে উঠে ব্যায়াম করতেন রোজ। জাঁদরেল এক পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়তেন আর প্যাঁচ শিখতেন। খুব মজবুত শরীর তাঁর। তাঁর চেহারাটি কত মজবুত, কত ভালো আর কি চমৎকার, তা আর বলতে ! তাঁর নানা রকম ছবিতেই তো তোমরা তা দেখতে পাও।

তাঁর মায়ের সভা বসে ছাদের উপর সন্ধ্যাবেলা। কত রকম বেরকমের গল্প হয় সেখানে। রবিও প্রায় হাজির থাকেন সেই আসরে। রবি তাঁর টাটকা পুঁথি-পড়া বিদ্যে শুনিয়ে দেন মাঝে মাঝে। কোন কোন দিন রামায়ণের কিছু আওড়ে দেন, আর এতে মায়ের কাছে বাহবা পান খুব। রবি একদিন ছুটে এসে বললেন, 'শুনছো মা, এক অবাক কথা। এই যে সূর্য দেখছো আকাশে, ও কতদূরে রয়েছে জানো ? অনেক দূরে। রয়েছে

পৃথিবী থেকে ন' কোটি মাইল দূরে।' মা-কে তাক লাগিয়ে দেন এই কথা বলে।

মা তাঁর খুব সরল। সহজেই সব কথা বিশ্বাস করেন। কত রকমের কথা আসে তাঁর কাছে। মাকে একজন এসে শোনালে রাশিয়ানরা আসছে। সে সময় রাশিয়ানদের নামে লোকের খুব ভয়। রাশিয়ানদের গায়ে কি ভীষণ জোর! একটা রাশিয়ান সাতটা ইংরেজকে নাকি এক এক চড়ে মেরে ফেলতে পারে। রাশিয়ানরা আসছে শুনে তাঁর ভাবনা হোল। তাইতো, কি হবে সত্যিই যদি আসে! রবির বাবা নেই বাড়ীতে। পাহাড়ে গেছেন বেড়াতে। তাঁর ভাবনার কথা বাড়ীর কেউ কানে তুলছে না দেখে, তিনি রবিকে বললেন—"দেখ রবি, কর্তাকে লিখে দাও তো তুমি —রাশিয়ানরা নাকি আসছে। সত্যিই যদি এসে পড়ে, কি হবে তা হোলে?" রবি পড়লেন ভারি মুসকিলে। কি করে চিঠি লিখতে হয়, কি রকমের পাঠ লিখতে হয়, কিছুই জানেন না তিনি। এ দিকে মা দিচ্ছেন তাগিদ, না লিখলেই নয়। শেষে দপ্তরখানার মুনসীকে গিয়ে ধরলেন। তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে এক চিঠি লিখলেন বাবাকে যে রাশিয়ানরা নাকি আসছে, কি উপায় হবে এখন। চিঠির জবাব এলো। তাঁর বাবা লিখলেন—'কোন ভয় নেই তোমার। রাশিয়ানদের নিজেই আমি তাড়িয়ে দোব।' এই জবাবে মায়ের ভাবনা হয়তো গেল না। তবে রবি হলেন নির্ভয়।

ছাদের বাগান



রবির নতুন বৌঠাকরুণ। তাঁর কাছে রবির ভারি আদর। রবি তাঁর যত সব টুকিটাকি ফরমাসী কাজের সাথী। ছাদের উপর শুকোয় জারক নেবু, আমসি, সর্ষের তেলে ইঁচড়ের আচার, কেয়া খয়ের, আমসত্ত্ব এই রকম সব মজাদার জিনিস। রবিকে কখনো কখনো পাহাড়া দিতে হয় এই সব। বৌঠাকরুণ কোন কোন দিন তাঁর উপর জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার ভার দেন। খুব সরু সরু করে চমৎকার সুপুরি কাটতে পারেন রবি। বৌঠাকরুণ তারিফ করেন তাঁর হাতের সুপুরি কাটা দেখে আর রবি হন খুসি।

ছাদের লাগাও ঘরে থাকেন তাঁর বৌঠাকরুণ। গোটা ছাদটা হয়ে উঠেছিল যেন একটা বাগান—এত গাছপালা সেখানে। করবী, দোলনচাঁপা, রজনীগন্ধা, চামেলী, গন্ধরাজ, পিলপের উপরে সারি সারি পামগাছ– এই রকম আরো কত। রবির মন ভরে থাকে ফুলের গন্ধে আর শোভায়।

শুধু কি ফুল গাছ! খাঁচায় খাঁচায় পাখীও ঝুলছে নানা জাতের। কাকাতুয়া, ময়না, শ্যামা। শ্যামা পাখীর শিস্ ওঠে

ফোয়ারার মতো। ময়না আওড়ায় নানান বুলি। পা তুলে তুলে নাচে কাকাতুয়া আর ম্যঝে মাঝে চেঁচায়।

বৌঠাকরুণের সখ হোল কাঠবেরালি পোষবার। খাঁচার মধ্যে পোরা হোল ছুটোকে ধরে। কাঠবেরালির খাওয়া দেখতে কি চমৎকার। লেজ ফুলিয়ে পিঠের উপর তুলে দেয়। পিছনের ছুটো পায়ের উপর দাঁড়ায় উঁচু হয়ে। সামনের ছুটো হাতে মুঠো করে ধরে খাবার। তারপর মুখে দিয়ে কুড়ুর কুড়ুর করে খেতে থাকে যখন, কি মজা দেখতে! রবি তাদের খাওয়া দেখেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তবে ভারি ছটফট করে কাঠবেরালিগুলো। কষ্ট হয় কি এদের? রবি একদিন তাঁর বৌঠাকরুণকে বলেছেন—

—কাঠবেরালি ছুটো খাঁচার ভেতরে থেকে সুখে নেই একটুও।

—কি করে বুঝলে যে সুখে নেই?

—এত ছটফট করে কেন?

—ও! তাই নাকি?

—কি হবে খাঁচায় পুরে রেখে। ছেড়ে দিন না এ ছুটোকে।

—তোমায় আর বাহাছুরি করতে হবে না।

এই বলে বৌঠাকরুণ চলে গেলেন। কাঠবেরালি ছুটোর ছটফটানি রবির আর ভাল লাগলো না। একদিন চুপি চুপি দিলেন খাঁচার দরজাটা খুলে। আর অমনি কাঠবেরালি ছুটো খাঁচা থেকে বেরিয়ে 'কিড়িক্ কিড়িক্' করতে করতে দে দৌড়।

ছাদের বাগানে পুতুলের বিয়েতে মাঝে মাঝে ভোজের পাতা পড়ে। ভোজের দিন রবি হয়ে ওঠেন প্রধান একজন। বৌঠাকরুণ রাঁধতে পারেন যেমন ভালো, যত্ন করে খাওয়াতেও ভালো বাসেন তেমনি। রবি থাকেন হাজির—ফাঁক দেন না কোন তাতেই।

ইস্‌কুল থেকে ফিরে এলেই বৌঠাকরুণের হাতের তৈরী খাবার থাকে মজুদ। কত তরিবত করে, কত রকমের খাবার দেন রবিকে। বিকেলবেলা যেদিন তিনি চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতা ভাত মেখে দেন খেতে সামান্য একটু লঙ্কা দিয়ে, সে দিন তো তাঁর আরো মজা।

কাব্য হোল সুরু

রবির সম্বন্ধে একটা বড় কথা এবার বলতে হয়। রবি কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতা লেখার আরম্ভটি ভারি চমৎকার। ভাগনে সত্য দুপুরে একদিন রবিকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন—

—দেখ রবি, তোমাকে পদ্য লিখতে হবে।

—পদ্য লিখবো ? সে তো ছাপার বইয়ে থাকে ! তা আবার লেখা যায় নাকি ?

—লেখা যায় না তো কি ? কথা জুড়ে জুড়ে চোদ্দটা অক্ষর মেলাও দেখি ! তা হলেই দেখবে, পদ্য হয়ে গেছে—তার মানে কবিতা।

—অ্যাঁ, তাই নাকি !

রবি কথা জোড়েন আর চৌদ্দ অক্ষর মেলান। মিলিয়ে বলেন—

—বাঃ রে ! এই তো মিললো ! এই তো হোল কবিতা।

রবির মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা, যেদিন তিনি বিদ্যালয়ে প্রথম ভাগে পড়েছিলেন—

জল পড়ে
পাতা নড়ে

তাঁর জীবনে এই হোল আদি কবিতা। এই দুই লাইনের কবিতাই তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল সেদিন। এখন নিজেই আবার কবিতা লিখে ফেললেন দেখে খুসি আর ধরে না।

একবার যখন শুরু হোল কবিতা লেখা, তখন আর পায় কে? হরদম কবিতা লিখতে লাগলেন। কাছারীর আমলাদের কাছ থেকে যোগাড় হলো নীল কাগজের এক খাতা। তাতে পেনসিল দিয়ে আঁকা-বাঁকা লাইন টেনে বড় বড় হরফে কবিতা লিখে যেতে লাগলেন। কবিতা লিখে কাউকে না শোনালে আর মজাটা হোল কি! প্রথম প্রথম আমলাদের শোনাতে লাগলেন, তারপর বাড়ীতে যিনি আসেন তাঁকেই ধরেন কবিতা শোনবার জন্য। অনেক সময় শুনতে চান না কেউ। রবিও ছাড়েন না। কবিতা শুনে অনেকে আবার হাসেন। একবার কেউ হাসলে আর তিনি সেদিক মাড়ান না।

একবার তাঁর কবিতা শোনা নিয়ে একজন হাসছেন, এমন সময় কানে এলো সেতারের ঝংকার। "শ্রীকণ্ঠ বাবু এসেছেন, এবার তাঁকেই শোনাই গে"—এই বলে রবি ছুটলেন সেদিকে।

শ্রীকণ্ঠ বাবু রবির বাবার একজন সঙ্গী। এ বাড়ীতে প্রায়ই এসে থাকেন। ছেলেদের সঙ্গে খুব ভাব। এমন ভালো লোক আর হয় না। একটি সেতার এঁর কোলে কোলে ফেরে সব সময়।

মাথা ভরা টাক। মুখের মধ্যে একটাও দাঁত নেই, তবে গান লেগে আছে সবখন। সবাই হাসি খুশী। ইনি থাকলে আর রবির কবিতা শোনবার লোকের অভাব হয় না। রবি প্রাণ ভরে এঁকে কবিতা শোনান। রবির কবিতা এঁর কি ভালই যে লাগে! কবিতা পড়া হয়, আর ইনি সেতারে ঝংকার দেন—গান ধরেন। যখন ফুর্তি হয় খুব, দাঁড়িয়ে উঠে নেচে নেচে সেতার বাজাতে থাকেন। গাইতে থাকেন মাতোয়ারা হয়ে। রবিকেও গাইতে হয় এঁর সঙ্গে সঙ্গে।

রবি যে কবিতা লেখেন, একথা রটে গেল সব জায়গায়। ইস্কুলের ছেলেরা জেনে গেল রবির কবিতা লেখার কথা। একদিন কবিতা শোনাচ্ছেন ছেলেদের, একটা ছেলে বলে উঠলো, "ও, কবিতা লেখা হয়। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা!" ছেলেটা ছুটে গিয়ে ইস্কুলের একজন মাষ্টারকে বলে দিল। ডাক পড়লো রবির। ছেলেরা ভাবলে, কি বকুনিই হয় দেয় এবার! কিন্তু ফল হল উলটো। মাষ্টার মশাই রবিকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—"রবি, তুমি নাকি কবিতা লেখ?" রবি ঘাড় নাড়লেন যে, লেখেন। মাষ্টার মশাই তখন বললেন, "বেশ, আমি গোড়ার দু'লাইন বলি, তুমি শেষের দু'লাইন মিলিয়ে দাও দেখি! দেখি কেমন তুমি কবিতা লেখ?" মাষ্টার মশাই বললেন—

রবি করে জ্বালাতন আছিস সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই!

রবি এর সঙ্গে শেষের দু'লাইন জুড়ে মিলিয়ে দিলেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

মাষ্টার মশাই এই দেখে মহা খুসি,—"বাঃ, বেশ হয়েছে। সত্যিই তুমি কবি!"

রবির সেই নীলখাতাটি ভরে উঠতে লাগলো কবিতায়, এক দিন তিনি লিখলেন—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিকে নিস্তব্ধ,
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

এই কবিতাটি ভাল করে পড়ে এর মানেটা বুঝে নাও দেখি। মানে বুঝে নিলে তোমাদেরও জিভে জল এসে যাবে।

ভালো গানের পুরস্কার

রবি কবিতা লেখেন যেমন ভালো, গানও লেখেন তেমনি ভালো। শুধু লেখা নয়, গাইতেও পারেন চমৎকার। বাড়ীতে তাঁকে গানের মাস্টারের কাছে গান শিখতে হয়েছে ঠিকমতো করে। তাঁর গলার সুর এমন মধুর যে, যে শুনবে তাঁর গান সেই মোহিত হবে। রবির বাবা রবির মুখে গান শুনতে খুব ভালবাসেন। কবিতায় আর গানে তাঁকে খুব উৎসাহ দেন।

একবার তাঁর বাবা তাঁর মুখে গান শুনতে চাইলেন। রবি একটি একটি করে কয়েকটি গান গাইলেন। সবগুলিই তাঁর নিজের লেখা। রবি গাইলেন—

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,
রয়েছে নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছে গোপনে।

...   ...

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি
যত জানি তত জানিনে।

... ...

এই গানটি আরো অনেকখানি। বড় হয়ে তোমরা সবটা জানবে। ভগবানের বিষয়ে রবির লেখা এই গানটি শুনে তাঁর বাবা এমন মোহিত হোলেন যে, রবিকে তিনি পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দিলেন। এই ঘটনাটি কিন্তু অনেক পরের। তা হলেও এখানে এটি বললুম।



বই পড়ায় বিষম ঝোঁক

তোমাদের মনে আসতে পারে একটা কথা,—রবি তো দেখি কবিতা লিখতে লাগলেন খুব। লেখাপড়াও করেন তো। না শুধু কবিতাই লেখেন? লেখাপড়া করেন বৈকি। সকল রকমের বই পড়েন আর খুব পড়েন। বই পড়ার দিকে ভারি তাঁর ঝোঁক। বই দেখলেই পড়া চাই তাঁর। একবার এক মজা করে বসলেন বই পড়া নিয়ে।

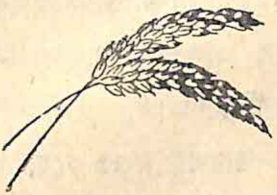
বাড়ীর এক মহিলার হাতে একখানা বই দেখে তাঁর পড়বার খুব লোভ হোল। অনেক করে বইটা চাইলেন। তবুও পেলেন না। তখন রবির হোল জিদ, বইটা তিনি পড়বেনই। যাঁর বই তাঁরও হোল জিদ, দেবেন না কিছুতেই! বইখানাকে তিনি বাক্সের মধ্যে রাখলেন চাবি দিয়ে। রবি বললেন,—

—চাবি দিয়ে রাখুন আর যা-ই করুন, ও বই আমি পড়বই।
—কি করে পড়, দেখি।
—দেখবেন তখন, কি করে পড়ি।
রবি ঠিক করলেন চাবিটা চুরি করবেন।

মহিলাটির তাস খেলার খুব সখ। দুপুরে তিনি তাস খেলছেন। পিঠে ঝুলছে আঁচলে-বাঁধা চাবিটা। খেলা যখন খুব জমেছে, রবি তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন আর চুপিচুপি চাবিটা খুলে নিতে গেলেন। হাত লাগিয়েছেন, অমনি ধরা পড়ে গেলেন। রবি গেলেন ঠকে।

একটু ভেবে আর এক উপায় ঠিক করলেন। মহিলাটির তাস খেলার সখ যেমন, পান-দোক্তা খাবার সখও তেমনি। একটু পরে রবি অনেক পান-দোক্তা জোগাড় করে এনে তাঁর সামনে রেখে দিলেন। তিনি পান খান আর থেকে থেকে পিক্ ফেলতে ওঠেন। এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন রবি। এবার আঁচল থেকে চাবিটা এসে গেল রবির হাতে। বাক্স খোলা হোল,—বইও পড়া হোল। তারপর? তারপর বই আর চাবি একসঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন যখন তার মালিককে, রবির কীর্তি দেখে তো তিনি অবাক!

এটা তবে ঠিক চুরি নয়—এটা একটা বুদ্ধির খেলা।



ধান ক্ষেতে চাল ফলে

রবির এবার পৈতা হোল। পৈতার সময় তাঁর মাথাটি একেবারে নেড়া করে দেওয়া হোল। তা যেন হোল। এখন তিনি নেড়া মাথাটি নিয়ে ইস্‌কুলে যান কি করে! মহা ভাবনায় পড়লেন। হঠাৎ এই সময় তাঁর ডাক পড়লো তেতলার ঘরে, তাঁর বাবার কাছে। সেখানে হাজির হতেই তাঁর বাবা বললেন, "রবি, হিমালয়ে বেড়াতে যাবে কি আমার সঙ্গে?" বাড়ীর বাইরে এক পা যিনি বাড়াতে পান না, তিনি যাবেন কিনা একেবারে হিমালয়ে! কোথায় নেড়া মাথা নিয়ে ইস্‌কুলে যাবার ভাবনা, আর কোথায় হিমালয় যাত্রা! এর চেয়ে খুসির কথা আর কিছু হতে পারে? তিনি বললেন—যাব-যাব-যাব।

তারপর একদিন ভাল পোশাক পরে তাঁর বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। এই প্রথম তিনি জমজমাট পোশাক পড়লেন। জরির কাজ করা একটা গোল মখমলের টুপি

হয়েছিল। সেটাও তাঁকে নেড়া মাথায় পরতে হোল। এবার রেলগাড়ীতে চড়তে হবে। এই প্রথম তাঁর রেলগাড়ীতে চড়া। ভাগনে সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁকে, রেলগাড়ীতে চড়া সোজা কথা নয় মোটেই। খুব সাবধান হয়ে গাড়ীতে উঠতে হয়। পা ফস্‌কে গেলে আর দেখতে হবে না! গাড়ীতে উঠে গায়ে যত জোর আছে, সব জোর লাগিয়ে বসে থাকতে হয়, তা নইলে কোথায় যে ছিটকে ফেলে দেবে তার ঠিক কি!

সত্যর কথায় মহাভয় তাঁর মনে। তারপর অবাক হয়ে গেলেন দেখে যে, খুব সহজেই তিনি গাড়ীতে চড়তে পারলেন। গাড়ীও ছেড়ে দিল খুব সহজেই, আর তিনি ছিটকেও পড়লেন না। যা ভেবে রেখেছিলেন, তার কিছুই হোল না। তাঁর ধারণার সঙ্গে কিছুই মিললো না দেখে মনটা কেমনতরো হয়ে গেল।

তারপর গাড়ী ছুটে চললো। মাঠ, গাছপালা, গ্রাম ঠিক যেন ছবির ঝরণার মতো রেলগাড়ীর হুদিক দিয়ে ছুটতে লাগলো।

প্রথমে তাঁরা পৌঁছুলেন বোলপুরে। এখানে চারদিক ফাঁকা, ধূ ধূ করছে মাঠ। পালকিতে চড়লেন। পালকিতে চড়েই চোখ বুজে রইলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভাবলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা আবছা দেখে মজা নষ্ট করবো না। সকাল বেলায় সমস্ত বোলপুর একসঙ্গে যখন চোখের সামনে খুলে যাবে, সেই হবে চমৎকার।

বাইরে তো যান নি কখনও। বোলপুরের খোলা জায়গা দেখে ভারি ভালো লাগলো তাঁর। তাঁর বাবা তাঁকে যেখানে

খুসি বেড়াতে বললেন। এতে তিনি একেবারে মহা খুসি। ভারি ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেন খাঁচার পাখা ছাড়া পেয়েছে !

মাঠে গিয়ে কেবলই তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেন আর আপন মনে বলেন—"কই, রাখাল ছেলেদের ত দেখছি না ! ধান গাছও তো কই দেখছি না ! সত্য কি বলে দিলে তা হলে ?" হয়েছে এই যে, সত্য তাঁকে বলে দিয়েছেন যে, বোলপুর ভারি এক মজার জায়গা। এখানে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খুব খেলা করতে পাওয়া যায়, আর এখানে মাঠের চারদিকেই ধান ফলে আছে। ধান ক্ষেত অনেক। ক্ষেত থেকে যত খুসি চাল তুলে নিয়ে এস। চাল তুলে নিয়ে এসে ভাত রেঁধে ফেল আর রাখাল ছেলেদের নিয়ে একসঙ্গে বসে খাও। এই একটা খেলা এখানকার। আর এটা খুব জমাটি খেলা।

শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হলেন দেখে যে, এখানে ধানের ক্ষেত কোথাও নেই, আর রাখাল ছেলেরাই বা কোথা ? ধানের ক্ষেতও নেই, রাখাল ছেলেদেরও দেখা পাওয়া গেল না, এতে মন তাঁর ভারি খারাপ হয়ে গেল।

তবে তাঁকে এখানে আটকে রাখবার যে কেউ নেই, এতেই তাঁর ভারি আমোদ। খোয়াইয়ে খোয়াইয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান। নানা রকমের পাথর কুড়িয়ে এনে বাবাকে দেখান। তাঁর বাবা খুসি হন দেখে। কোনদিন বা খোয়াইয়ের জলে ছোট ছোট মাছ দেখে এসে তার গল্প বলেন। তার বাবা খুসি হন শুনে।

এখানে তাঁর কবিতা লেখাও চলে খুব। একটা নারিকেল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে কবিতার পর কবিতা দিয়ে একটা নতুন খাতা ভরিয়ে ফেললেন।

বোলপুরে কিছুদিন থেকে তারপর দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর হয়ে একেবারে তারা হিমালয় পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছুলেন। ঝাঁপানে করে পাহাড়ে ওঠবার সময় চারদিকের শোভা দেখতে দেখতে চললেন। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কত রঙ বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনা নেমে চলেছে ঝর্ ঝর্ করে ; কোথাও ফসল হয়ে রয়েছে—তার উপরে রোদ লেগে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে ; কি চমৎকার তার বাহার ! এই সব দেখতে দেখতে তারপর তাঁরা হিমালয়ের যে জায়গায় গিয়ে উঠলেন, তার নাম ডালহৌসি। খুব উঁচু এই জায়গা। এইখানেই তাঁরা বাসা করে রইলেন।



ডালহৌসির চূড়ায় পৌঁছে দেখলেন, এ যেন এক ভিন্ন জগৎ। এখানকার আলো বাতাস—সেও যেন আর এক রকমের—শুধুই যে সুন্দর তা নয়, এমন তার গুণ যে শরীরকে তাজা করে রাখে আর মনকে করে রাখে প্রফুল্ল।

'ঐ যে সামনে আর একটা চূড়া! ওখানে কি যাওয়া যায়? ওর মাথার উপরে ওই যে চমৎকার সবুজ গাছটি, যেটি ওর মাথায় বেশ একটা ছাতার মতো হয়ে রয়েছে—ওর নীচে কি কেউ থাকে? আর ওই যে সরু একটা লাল দাগ সবুজ গাছপালার ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বরাবর একেবারে নীচে নেমে গেছে—ওটা কি যাতায়াতের পথ? ওখানে যেতে পারলে বেশ হয়! ওই তো দেখা যায়!' কিন্তু ওই চূড়োটা এত দূরে আর এমন দুর্গম যে, কোন মানুষেই পেঁছুতে পারে না ও জায়গায়।

রবি পাহাড়ের ও-পারে সূর্য ডোবা দেখেন। দেখে অবাক

হন। দিনের কাজ শেষ করে সূর্য যখন অস্ত যায় পাহাড়ের পিছনে, তখন সে সমস্ত-হিমালয়কে আর তার গাছপালা আর মাথার উপরের আকাশকে আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে চলে যায়! ও-দিকে সূর্য অস্ত যায় আর এ-দিকে খানিক পরেই হিমালয়ের উঁচু মাথায় চাঁদের মুকুট ঝলমল করতে থাকে। আবার অন্ধকার হোলে কোটি কোটি নক্ষত্রের চাঁদোয়া দেখা যায় মাথার উপরে। সূর্য, তারা, চাঁদ আর আকাশের নানান্ খেলা দেখতে দেখতে এক ভিন্ন জগতে চলে যান রবি।

এখানেও সেই বেড়াবার মজা, বরং আরো অনেক বেশী। পাহাড়ে জায়গা, ভয় ডর আছে কত রকমের। সে সব দিকে খেয়ালই নেই তাঁর। তাঁদের বাসার নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে মস্ত এক কেলুবন। এই বনের বড় বড় গাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে কত কাল ধরে, কে তা বলবে? তিনি এই কেলুবনে ঢুকে ঘন ছায়ায় মধ্যে চুপটি করে বসে থাকেন। শুনতে পান, বনের লতা পাতাগুলো তাঁকে দেখে যেন কানাকানি করছে। গাছের ডালপালা সর্‌সর্‌ ঝর্‌ঝর্‌ করে যেন কত কি কথা কইছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা ডেকে ডেকে উড়ে চলেছে। চেয়ে দেখেন, আকাশের কোলে মেঘ, আর দেখেন—

'মেঘের কোলে কোলে
যায় রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া-মোর মনের কথা
যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।'—

বিভোর হয়ে থাকেন এই সব দেখেশুনে। ঘরের কথা মনেই থাকেনা তখন। হিমালয়ের সঙ্গে চলে তাঁর মনের কথা।

পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে। এক একদিন তিনি একটা বড় লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে চলে যান আর এক পাহাড়ে। হিমালয় যেন তাঁকে ডাক দিয়ে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কি তার শোভা, আর কি তার রূপ! কি বিরাট, আর কি মনোহর! হিমালয়ের আকাশ বাতাস তাঁর মনকে দেয় ভরিয়ে। খোলা আলো বাতাসে পান তিনি মুক্তির স্বাদ।

পাহাড় বেরিয়ে ফিরতে দেরি হয় কোন কোন দিন। ফিরে এসে বেড়ানর গল্প করেন বাবার কাছে। এখানে যে শুধু বেরিয়ে বেড়ানই তাঁর কাজ, তা নয়; সকালে দুপুরে লেখাপড়াও করতে হয়, তাঁর বাবার কাছে বসে। তাঁর বাবা তাঁকে কত উপদেশের কথা বলেন, কত মজার মজার গল্প শোনান, রোজ রাতের বেলা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দেন।

এখানে রোজ তাঁকে বরফগলা জলে নাইতে হয়, তাঁর বাবার কথামতো। এতে শরীর নাকি খুব ভাল হয়। একে পাহাড়ের দারুণ শীত, তার উপর বরফগলা জল। ওঃ, সে যে কি কষ্ট তাঁর! চাকরদের বললেন—'দেখ, তোমরা খানিকটা করে গরম জল ঘড়াতে যদি মিশিয়ে দাও তো বেশ হয়। যে শীত করে আমার!' চাকরেরা বললে, 'ওরে বাবা! তা কি পারি—কত্তার অমতে?' রবি কি আর করবেন! রেহাই পেলেন না। বরফ-গলা জলেই নাইতে হয় তাঁকে।

আরো এক মুসকিল দুধ খাওয়া নিয়ে। অনেকটা করে দুধ খেতে হয় তাঁকে। অত বেশী দুধ খেতে পারেন না তিনি। শরীর আনচান করে। অথচ ফাঁকি দেবারও উপায় নেই। বাবার কাছে বসে খেতে হয় সবটা দুধ। আবার তিনি চাকরদের ধরলেন। বললেন—'আমার দুধটা তোমরা কমিয়ে দাও, যেমন করে পার।' এবার আর অমত হোল না, দুধের বেলাতে সহজেই রাজী হয়ে গেল। এরপর থেকে তারা ফেনার ভাগ বেশী করে দিয়ে দুধের ভাগ কম করে দিতে লাগলো।

কয়েকমাস ধরে পাহাড়ে থেকে সত্যিই তাঁর চেহারাটি হোল অতি চমৎকার। এই সময়ের ভেতর তিনি অনেক বই পড়ে ফেললেন, অনেক বিষয় শিখে ফেললেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল বড় জোর এগারো-বারো। তাঁর এক নতুন জীবন শুরু হোল এখান থেকে। এখন তাঁর বাড়ী ফিরবার সময় হোল। তারপর একদিন তাঁর বাবা তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন, নিজের একজন লোকের সঙ্গে।

মায়ের কাছে কতই আদর!

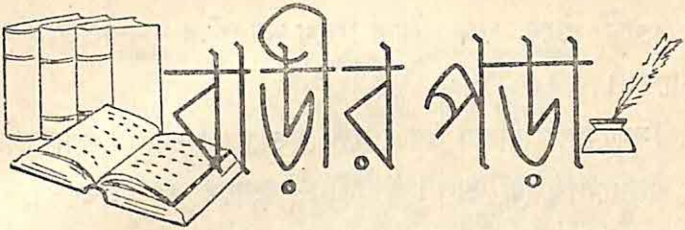
রবি কলকাতায় ফিরে এলেন একেবারে নতুন মানুষ হয়ে। বাড়ীতে তাঁর আদর গেল বেড়ে সকলের কাছে। চাকরদের শাসন গেল ঘুচে। মায়ের আসরে বেশ একটা বড় আসন পেলেন তিনি। হিমালয় পাহাড়—মায়ের কাছে তার কত গল্প, কত কথা। শেষ আছে কি তার ? একদিন বললেন,—'দেখ মা, এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে চড়তে গিয়ে একবার খুব বেঁচে গেছলাম। কি হয়েছিল জানো মা ? চলেছি একদিন ওতরাই দিয়ে। আমি কি জানি অত ? এক জায়গায় গাছের তলায় পড়ে রয়েছে শুক্‌নো পাতার রাশ। পা পড়লো তারি উপর। পা গেল হড়্‌কে। ব্যস্, আর দেখাশোনা নেই। গড়াতে গড়াতে এই পড়ি আর কি এক ঝরনার মধ্যে গিয়ে। হাতে ছিল ফলা লাগানো লম্বা লাঠি। ধাঁ করে ঠেকিয়ে দিলুম একটা পাথরে, তাই বাঁচোয়া। নইলে কি হোত জানো ? গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে যে পড়তুম তার কিছু ঠিক ছিল কি ? রবির এই ভয়-লাগানো গল্প

শুনে মা আঁতকে ওঠেন। এই রকম, পাহাড় বেড়ানোর কত গল্প করেন রবি তাঁর মায়ের কাছে। মা শুনে কখনো হন খুসি, কখনো পান ভয়।

হিমালয় থেকে ফিরে এসে রবি ইস্‌কুলে যাবার নামটি আর করেন না। মায়ের কাছে বসে পাহাড় বেড়ানোর গল্প হয়, কবিতা শোনানো আর রামায়ণ পড়া হয়। এই সবেতেই তাঁর যত ফুর্তি। আর যেই ইস্‌কুলে যাবার কথা হোল, অমনি মুখটি গেল শুকিয়ে। আবার অভিমান কত!

… …

"যাঁরা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান।
ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান।
… …
আমি তো, মা, চাইনে আদর
তোমার আদর ছাড়া।
তুমি যদি মূর্খ ব'লে
আমাকে, মা, না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদলা-মেঘের পাড়া।"
… …



বাড়ীর পড়া

যাক—তাকে পালাতে হোল না কোথাও, ইস্‌কুলেও আর যেতে হোল না। বাড়ীতে পড়াই ঠিক হোল। ইস্‌কুল ঘরটাকে তাঁর মনে হোত যেন পাহারাওয়ালা। কাজেই ইস্‌কুলের বাঁধাধরা পথে কেউ তাঁকে চালাতে পারলেন না কোনমতেই।

কিন্তু বাড়ীতেই তাঁর শেখবার জিনিস কত। তাঁদের বাড়ী তো আর সাধারণ লোকের মত নয়। কত জ্ঞানী-গুণী আসা-যাওয়া করেন এ বাড়ীতে। কত ভালো ভালো জিনিসের চর্চা হয় এখানে। তাঁর দাদারা সবাই গুণী, তাঁরা আট ভাই। কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাটক অভিনয়ে এঁদের সকলের উৎসাহ কত। এই আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ হতে লাগলেন রবি। ইস্‌কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে কি হয়, এখন লেখাপড়ার দিকে এমন তাঁর ঝোঁক হোল যে, কোথায় লাগে ইস্‌কুলের পড়া। সব রকমের বাংলা বই তিনি পড়ে ফেললেন। তবে তাঁর কবিতার দিকেই মন

গেল বেশী। তাঁর বয়স যত এগুতে লাগলো কবিতা চর্চাও তত বেড়ে চললো। শুধুই কি কবিতা! কবিতার সঙ্গে গান। তাঁদের বাড়ীতে দিনরাত গানের হাওয়া বইতো বললেই চলে। গান শুনে শুনে আর লিখে লিখে মন তাঁর গান-রাজ্যেই ঘুরে বেড়াতো।

ইস্কুলের বাঁধাধরা পথ ছেড়ে দেওয়াতে তাঁর লেখাপড়ারও ফল দাঁড়ালো খুব ভাল। বাড়ীর পড়াতে যা লিখলেন, তা ইস্কুলের পড়ার চেয়ে অনেক বেশী। নানা রকমের বই তিনি পড়তে লাগলেন, আর সেই সব বইয়ের বিষয় এমন করে শিখে ফেলতে লাগলেন যে, তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। ইংরেজী এমন শিখলেন যে, "ম্যাকবেথ" তর্জমা করে ফেললেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস কোন কিছুই বাকী রইলো না পড়তে। তবে নাই বা গেলেন ইস্কুলে! তোমরা কেউ পার কি এত সব পড়তে, এত ছোট বয়সে?

বড় হোলেন ছোট রবি

রবি আর ছোট রইলেন না—দিন দিন বড় হোতে লাগলেন, আর তাঁর ছোট বেলাকার কথাও শেষ হয়ে এলো এবার। তোমরা দেখলে যে তিনি ইস্কুল-পালানো ছেলে। এই ইস্কুল-পালানো ছেলেই হলেন পৃথিবী বিখ্যাত কবি—এমন যে, এ যুগে তেমন আর হয় নি।

তোমরা শুনলে তাঁর ছোট বেলার কথা—তিনি কত উদার কত ভাবময়, কত সরল ও মনোহর! এই ভাবেই তিনি বড় হোলেন। ছেলেবেলার খেলাধুলো, খেয়াল আর ভাব পরে তো মিথ্যেই হয়ে যায়! রবির জীবনে সে সব কিন্তু সত্য হয়েই রইলো। তাঁর এই সব খেয়াল আর ভাব অতি অপরূপ ভাবে ফুটে উঠতে লাগলো তাঁর কবিতা গান আর লেখার ভেতর দিয়ে।

রবি বড় হোলেন—বড় থেকে আরো বড় হোলেন। কত মহৎ কাজ করলেন তিনি। যেমন হোল তাঁর নাম-ডাক, তেমনি হোল তাঁর মান-যশ। কবি বলে চিনলো তাঁকে সবাই, জানলো তাঁকে সারা পৃথিবীর লোক। সেরা পুরস্কার পেলেন তিনি। পৃথিবীর সব দেশ ডাকতে লাগলো তাঁকে আদর করে—তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শোনবার জন্য। যেখানে যান তিনি, সেখানেই পান রাজার মান। তাঁর বিষয়ে এই সব কথা বড় বড় বইয়ে এর পর তোমরা পড়বে—যখন তোমরা বড় হবে। যত পড়বে তাঁর কথা আর তাঁর বই, ততই বুঝবে যে সত্যিই তিনি কত বড়।

বুড়ো হয়েও বুড়ো নন



তিনি বড় হোলেন আর বুড়োও হলেন। আশ্চর্য এই যে বুড়ো হলেও মনটি তাঁর রইলো ঠিক দশ-এগারো বছরের ছেলেমানুষটির মতো। এই নিয়ে ভারি এক মজার কথা বলেছেন তিনি নিজেই। বলেছেন—

"বিধাতার নিজের হাতের তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোন দিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না।...তাই চিরদিনই তারা ছোটদের সমবয়সী হয়ে থাকে...হিমালয়ের মতই তারা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষির ঝরণাধারা কোন কিছুতেই তাদের শুকোয় না...।"

সত্যিই এমন অপূর্ব মানুষ আর দেখা যায় না। তোমাদের মতো ছোটদের তিনি যেমন ছিলেন আপনজন, তেমনটি আর কি কেউ হবেন? ছোটদের মর্ম তিনি বুঝতেন খুব ভাল করে। বুঝতেন বলেই তিনি মিশে যেতেন তোমাদের মতো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সমানভাবে। তাঁর কাছে তাঁর শান্তিনিকেতনে তোমাদের মতো কতো ছেলেমেয়েরাই যে থাকতো! তাদের নিয়ে তিনি গল্প করতেন, আমোদ করতেন, খেলা করতেন এমন-

ভাবে, যেন তিনি তাদেরই একজন আর তাদেরই সমবয়সী। ছোটরা ঘিরে বসত তাঁকে। তিনি আদর করে কারো মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, কারো পিঠ চাপড়ে দিতেন, আর সবারই হাতে দিতেন টফি, চকলেট, লজেঞ্জুস। তারপর গান গেয়ে শোনাতেন, কত মজার মজার ছড়া বলতেন। ছোটদের সঙ্গে যখন খেলার উৎসব জমিয়ে তুলতেন তিনি, তখন তা কি অপরূপই যে দেখাতো! সারা ভুবনের রবি তখন ছোট হয়ে ধরা দিতেন ছোটদের কাছে।—

"...আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।"

এই কথাগুলি তখন ঠিক একেবারে মিলে যেত। তিনি কত বড়, অথচ মিশতেন কত ছোট হয়ে। বলেছেন তিনি—

"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।"

সত্যিই তিনি হাসির মতন করেই ছোটদের জীবন গড়ে গেছেন তাঁর শান্তিনিকেতনে।

তাঁর শান্তিনিকেতনের ইস্কুলটি তিনি আগাগোড়া নিজের হাতে গড়েছেন, কতই না যত্ন করে।



শিশুর সাথী বিশ্বকবি

ছোটবেলায় নিজে তিনি কত দুঃখই না পেয়েছেন ইস্‌কুলে যাওয়া নিয়ে। সেই কথা মনে করে এই ইস্‌কুলটি তিনি ছোটদের মনের মতো করে তৈরী করেছেন। এখানে লেখাপড়াকে মোটেই ভয়ের বা ভাবনার চোখে দেখে না কেউ। এখানে পড়া হোল খেলা আর খেলা হোল পড়া। তাই, এখানকার ছেলেমেয়েদের কথাই হোল—

"মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি কাজ
জানিস্‌সে কি ভাই ?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।

খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।"

এই শান্তিনিকেতনের কথা বড় হয়ে তোমরা ভাল করে যখন জানবে, বুঝতে পারবে সত্যই এটি আমাদের কত বড় গৌরবের। পৃথিবীর এক সেরা জিনিস হোল শান্তিনিকেতন।

শান্তিনিকেতনে যারা থাকতো, তারা তো পেতো অনেক কিছুই। আর যে সব ছেলেমেয়ে বাইরে থাকতো—দূরে ? তারা ? তারা পেত না কিছুই ? তাদের জন্য তিনি কি কিছুই করতেন না ? করতেন বৈ কি। তাদের জন্য মজার মজার কবিতা লিখতেন, ছড়া লিখতেন। লিখে নিজেও খুশী হতেন, আর কাছের দূরের সব ছেলে-মেয়েকেই খুশী করতেন। শুনবে তাঁর দু'একটা মজার মজার কবিতা ?—

"ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ীর
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা সিন্দুকে,

টাকা কড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জানলায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে
চুন দেয় তারা ডালনায়।"

আর একটা শোন—

"ভোলানাথ লিখেছিল তিন-চারে নব্বই,
গণিতের মার্কায় কাটা গেল সবই।
'তিন-চারে বারো হয়,' মাষ্টার তারে কয়,
'লিখেছিনু ঢের বেশী,' এই তার গর্বই।"

আরো একটা শোন—

"একদিন রাতে—
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
রাস্তা চলিয়াছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর ওঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।

হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন্ রোড চলে তার পিছে পিছে।
... ...
মনুমেণ্টের দোল, যেন খেপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্কুল ছোটে হন্ হন্,
অংকের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।”

এই রকমের সব ছড়া, কবিতা আরো কত লিখেছেন তিনি।

তোমরা জানো যে, তিনি লিখেছেন অনেক। কিন্তু কত লিখেছেন, তা জানো কি? শুনলে অবাক হবে। লিখেছেন তিনি প্রায় সতেরো-আঠারো হাজার পৃষ্ঠা। এত বই যে, তা নিয়ে একটি লাইব্রেরী হয়। একজন সারা জীবনে তা পড়ে শেষ করতে পারবে না। তিনি ছবি এঁকেছেন প্রায় দু হাজার, আর তা এমন নতুন নতুন ভাবের যে, তাঁর ছবির নাম হয়েছে সারা পৃথিবীময়।

তাঁর কাছে চিঠি-পত্রই যে আসতো কত, তার কি কিছু হিসাব আছে? কত ছেলেমেয়ে কত কি আবদার জানিয়ে তাঁকে লিখতো। তিনি মহাখুশী হয়ে নিজের হাতে সকলকে জবাব দিতেন চমৎকার করে। একটি মেয়েকে লিখেছেন তার চিঠির জবাবে—

...“তুমি লিখেছ আমাকে গাড়ীতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি, আমাকে দেখতে নারদ মুনির মত—

মস্ত বড় পাকা দাড়ি। ভয় করো না, আমি তাঁর মতো ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোট মেয়েদের সংগে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভাল মানুষটির মতো থাকবার চেষ্টা করবো…"

একবার একটি ছোট মেয়ে তাঁকে চিঠি লেখে। তাতে সে লিখেছিল—"হে কবি, তোমার সহজ পাঠ আমি পড়েছি। আমি বড় হোলে তোমায় দেখতে শান্তিনিকেতনে আসব।"

এই চিঠি পেয়ে কবি তখনি তার জবাব দিলেন। লিখলেন— "আমার ছোট বন্ধুটি, তুমি যখন আমার সহজ পাঠ পড়েছ, তখনই তোমার সংগে আমার জানা-জানি হয়ে গেছে। তুমি বড় হোলে আমায় দেখতে আসবে বলেছ। তা একটু তাড়াতাড়ি কর।"

এই রকমের কতশত চিঠি আসতো তাঁর কাছে। মহাখুশী হয়ে সব চিঠির জবাবই তিনি দিতেন নিজের হাতে। ছোটদের চিঠির জবাব দিতে কলম তাঁর নেচে উঠতো। ছোট একটি মেয়েকে তিনি লিখেছেন—

"লিখতে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচ্‌বে আজও আমার হাতে।

খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলাঘরে ;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথ হারানো তেপান্তরে।

নতুন চিকন অশথ-পাতা
সেই কলমে আপনি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।"

কি মজার সব চিঠি আর কি চমৎকার এর ভাব ! তোমাদেরও সাধ হয় নাকি, এমন একখানা চিঠি পেতে ? এই সব থেকে বুঝতেই পারো তোমরা যে, তিনি তোমাদের কত বেশী আপনার ছিলেন আর কত ভালবাসতেন তোমাদের সবাইকে।

ছোট থেকে বড় হয় তো সবাই। তবে আমাদের রবীন্দ্রনাথ যত বড়, তত বড় আর কি কেউ ? তিনি একজন মহাকবি আর মহামানব। তাঁর সঙ্গে আর কার তুলনা ? আকাশে রবি যেমন থাকেন সবার উপরে—সব উঁচুতে, আমাদের পৃথিবীর রবিও ঠিক তেমনি সবার উপরে। আকাশের রবি যেমন পৃথিবীর সকল লোককে দেয় তার আলো, আমাদের পৃথিবীর রবিও তেমনি সকল দেশের সকল লোকের মনে দিয়েছেন আলো—যে আলো হোল ভাবের আলো, আর মিলনের আলো। সে আলো নিভে

যাবে না কখনো। এসো, সবাই মিলে আমরা তাঁকে নমস্কার করি—

স্বদেশে যে সর্বপূজ্য, বিদেশে যে
রাজারও অধিক
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু ;
আর দশদিক,—
সর্ব ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে মেলে পাখা
যাহার অন্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি
স্বদেশ-আত্মার—"
নমস্কার ! নমস্কার ! বারংবার
তারে নমস্কার !

শেষ